দুই দানব।

আমরা সবাই জানি, সারা দুনিয়া জানে অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র নীতি কি রকম ভয়াবহ। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দুনিয়াময় অজস্র ষড়যন্ত্রের, সরকার বদলের, সামরিক অভ্যুত্থানের, রক্তপাতের, আগণিত এতিমের আর সংখ্যাহীন উজাড় গ্রাম-ধর্ষিতা রমণীর অভিশাপে কলংকিত পৃথিবীর এই সামরিক মহাশক্তি। জন্মলগ্ন থেকেই বোধহয় এর শুরু। শুধু জানি উনিশ'শো পঁয়তাল্লিশের ৬ই আর ৯ই আগষ্টে হিরোশিমা আর নাগাশাকি শহরে সাধারণ মানুষের ওপরে যে আণবিক বোমা ফেলা হল, তার পেছনের ইতিহাসও সমানভাবে কলংকিত। আর কলংকিত আটলান্টিক চার্টারের বিশ্ব-ঠকবাজী।

হিটলারের পতনের পর পঁয়তাল্লিশের জুন জুলাইয়ের দিকে জাপানের সামরিক বাহিনী সম্পুর্ণ ধ্বংস, তার অমিত-তেজ নৌবাহিনীর কিছুই বাকী নেই, আঘাত তো দুরের কথা আত্মঘাতী কেমিকেজ করার মতও যুদ্ধ-বিমান আর নেই। তখন জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো বাধ্য হলেন টোকিয়োতে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকের মাধ্যমে আত্মসমর্পনের প্রস্তাব পাঠাতে। কিন্তু সে প্রস্তাবের পরেও জাপানের শহরগুলোর ওপর বোমাবর্ষন থামল না। নিরুপায় তোজো এবার প্রস্তাব পাঠালেন সুইস রাষ্টদূতের মাধ্যমে। প্রস্তাব পৌঁছেও গেল, কিন্তু তবু বোমা বর্ষন থামল না হাজার হাজার জনসাধারণের ওপরে। আতংকিত উপায়হীন ব্যতিব্যস্ত জাপান সম্রাট এবারে আর কারো মাধ্যমে নয়, নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রিন্স কনোয়ে-কে সশরীরে পাঠিয়ে দিলেন মস্কোতে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে। প্রস্তাব পৌঁছেও গেল ষ্ট্যালিনের কাছে, তারপর পটাশাডমে মিটিং হল চার্চিল-ট্রুম্যান-স্ট্যালিনের। সে মিটিংয়ে এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাও হল। কিন্তু সে আলোচনায় আত্মসমর্পনের প্রস্তাবটা "নিচ্ছি নেব" করে করে শেষে কেয়ামত নেমে এল হিরোশিমাতে ৬ই আর নাগাসগাকিতে ৯ই আগষ্টে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম পরমাণবিক বোমা। আমরা ভুলিনি, আমরা কিভাবে ভুলব, অগণিত নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপরে সেই পাশবিক উন্মত্ত হত্যাযজ্ঞ শেষ করার পরে জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গৃহীত হল। আমরা এ-ও ভুলিনি, ইউরোপে সাদা চামড়ার জার্মানীর ওপরে না ফেলে এশিয়ার বাদামী চামড়ার ওপরে এই নরমেধ যজ্ঞ করা হল। (সুত্র - "আমি সুভাষ বলছি" ৩য় খন্ড- শৈলেশ দে পৃঃ ৩৫৬)

সেই পশু, এই পশু। মানুষের ইতিহাসে এ পশু বিভিন্ন চেহারায় অসংখ্যবার ফিরে ফিরে এসেছে আকাশ বাতাস আর কবিতা-গান ছিন্নভিন্ন করে।

ছয়চল্লিশে আমাদের পাকিস্তান প্রস্তাব এবং পরে মারী-চুক্তির দলিলে অক্ষর বদলের আর দলিল বদলের কলংক আমরা জানি। কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে আটলান্টিক প্রস্তাবের মত নির্লজ্জ আন্তর্জাতিক ফ্রড বোধহয় মানুষের ইতিহাসে আর নেই। একচল্লিশের দিকে হিটলারের মারাত্মক আঘাতে ইউরোপের যখন ত্রাহি অবস্থা, রোমেল-গোয়েবল্‌স্‌-গুডেরিয়ান-গুটেনবার্গ-রুনস্ট্যান্ড দলের মারাত্মক আঘাতে সারা ইউরোপে আগুন আর জান বাঁচানোর হুলুস্থুল, তখন সমস্ত তৃতিয় বিশ্বের উপনিবেশগুলোর সার্বিক সহায়তার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল বৃটিশ। তাই একচল্লিশের ১৪ই আগষ্টে সারা দুনিয়া শুনল যে বৃটেন-অ্যামেরিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়েছে, বলা হয়েছে যে যুদ্ধশেষে স-ব উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। পরাধীন সারা তৃতিয় বিশ্বে বয়ে গেল আনন্দের ঢেউ। পরের বছর বেয়াল্লিশের ১৪ই বর্ষপুর্তির উৎসবে আবার রুজভেল্ট একই ঘোষনা দিলেন, আটলান্টিক চার্টার হয়ে উঠল পরাধীন বিশ্বের মুক্তিসনদ। এসব ঘটনা দুনিয়াময় তাবৎ খবরের কাগজে ধরা আছে। কিন্তু চুয়াল্লিশের দিকে যুদ্ধের হাওয়া ঘুরে গিয়ে হিটলারের পতন যখন আসন্ন, তখন কি নির্লজ্জ ভাবে বেমালুম উল্টো মারলেন রুজভেল্ট, পরিষ্কার বলে

দিলেন, ''আটলান্টিক চার্টারে কেউ কোন স্বাক্ষর করে নি কারণ ওই নামে কোন দলিলই কোনকালে ছিল না''। আর চুরুট-ধারী চার্চিল? চুড়ান্ত এই পিছলা ঘুঘু আগেই বলে দিয়েছিলেন, মহারাণীর সাম্রাজ্য লাটে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী হননি তিনি। - I did not become the King's first Prime Minister to preside over the the liquidation of the British empire. (সুত্র- ''আমি সুভাষ বলছি'' ২য় খন্ড - শৈলেশ দে - পৃঃ ৩১০ থেকে ৩১৭)।

না, বিশ্ব-মানবতাকে জঘন্যভাবে ঠকানোর অপরাধে রুজভেল্ট-চার্চিলকে কোন আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি, ফাঁসীর দড়ি পরতে হয়নি গলায়। যেমন হয়নি ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের, কিংবা গোলাম আজম-মত্যানিজামীর, ওরা সবাই রাজকীয় জীবন কাটাচ্ছে কাটিয়েছে। তাই কখনো মনে হয়, ''সত্যের জয় হবেই'' - কথাটা বোধহয় পরাজিত মানুষের সান্ত্বনার আপ্তবাক্য ছাড়া আর কিছু নয়, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে, এটাই বোধহয় মানুষের নিয়তি। এর পরের ইতিহাস - ভিয়েৎনাম আর কম্বোডিয়ার- ইরাণের ডঃ মোসাদ্দেক, চিলির আলেন্দে, কংগোর লুমুম্বা, পানামার ধ্বংসযজ্ঞ, ব্রাজিলের ''বিপ্লব'', রাশিয়ার ভাঙ্গন, একের পর এক এই দানবের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের বজ্রমুষ্ঠিতে লক্ষ মানবের আর্তনাদের ইতিহাস সবাই জানেন। আর একাত্তরে? আমাদের মরণকামড়ে লড়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ খুন আর ধর্ষণের অপনায়ক নাপাক সৈন্যদলের এক নম্বর রাজাকার, আমাদের সম্পুর্ণ ধ্বংস করার জন্য পরমাণবিক বোমা দিয়ে পাঠানো যমদূতের মত সপ্তম নৌবহর ঘরের দোরে চট্টগ্রামে, কে এই দানব? আর কেউ নয়, অ্যামেরিকার ওই হোয়াইট হাউস, আসলে যা কিনা মানুষের রক্তে রক্তে অদৃশ্যে লাল, ইঁট দিয়ে নয় নিরপরাধ মানুষের হাড় দিয়ে তৈরী। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আমাদের জাতির পিতার খুনের পেছনেও এই একই অভিশাপ। আমাদের নেতাজী সুভাসের নামকে এরাই জাতিসংঘের সন্ত্রাসী-তালিকায় ঢুকিয়ে রেখেছে। এই এক বিশাল দানবের অত্যাচারে, ক্রমাগত ভড়ং আর মিথ্যাকথায়, সামরিক আস্ফালন আর উদ্ধত আগ্রাসনে, বিভিন্ন দেশের ভেতরে ষড়যন্ত্র আর নাক গলানোতে আজ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে পৃথিবীর মানুষ। এর ভিত্তিহীন বাহানা আর নিরন্তর যুক্তিহীনতায়, এর ক্রমাগত ঠকবাজী আর বিশ্ব-বিবেকের অপমানে, এর নির্লজ্জ অমানবিকতা আর শক্তির দম্ভে আজ কলুষিত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আকাশ বাতাস।

এই হল অনন্য অ্যামেরিকার জঘন্য পররাষ্ট্র-নীতি। এই এক বিষ ছাড়া জীবনের অন্যান্য দিকে তার অবদান অসামান্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিটি শাখায় আর প্রযুক্তিতে তার অবদানে সমস্ত মানবজাতি উপকৃত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর উন্নয়নে তার প্রচুর অর্থ-সাহায্য গরীব দেশগুলো পায়। এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে, কিন্তু টাকাগুলো নিজের দেশে খরচ না করে সে দেয় তো। এ পয়সায় কোন দেশের উন্নতি হয়না একথা বলেন কেউ কেউ। কিন্তু সেক্ষেত্রে গ্রহীতা দেশগুলোকে তো কোনদিনই দেখলাম না অ্যামেরিকার টাকা ফিরিয়ে দিতে। আর মধ্যপ্রাচ্যের মহারাজাদেরও দেখলাম না গরীব দেশগুলোর গনউন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য করতে মসজিদ মাদ্রাসা ছাড়া, যা দিয়ে শুধু জিহাদি বক্তৃতা প্রচার হয় আর ক্যাডার তৈরী হয়।

যাঁরা এই রাজনৈতিক ইসলামে বিশ্বাস করেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা দুয়োরাণী শারিয়ার লুকিয়ে রাখা রাক্ষসী-চেহারা জানেন, যাঁরা জামাত-বিরোধী, তাঁদেরও কেউ কেউ মনে করেন যে এখন যেহেতু অ্যামেরিকা-ই হচ্ছে মানবতার প্রধান শত্রু, এবং এ শত্রুকে সারা পৃথিবীতে যেহেতু একমাত্র বিশ্ব-জামাতই একটু হলেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তাই জামাতকে আঘাত করাটা এ মুহূর্তে ঠিক হবে না।

কতখানি ঠিক, কথাটা? আপনার ঘরে দু'দুটো বিষধর কালনাগ ঢুকে একে অপরের সাথে লড়াই করছে, - সাধারণ মানুষ হিসেবে দু'টোকে একসাথে হত্যা করার সময়-সুযোগ-শক্তি হয়ত আপনার নেই,- সেক্ষেত্রে সবাই মিলে এক্ষুনি যে যেটাকে যেভাবে পারেন আঘাত করবেন আর সে আঘাতে একে অপরকে সাহায্য করবেন? নাকি পঞ্জিকা খুলে সুলক্ষণ সুসময় বের করে বেছে বেছে ওদের একে একে আঘাত করবেন?

এ বড় সহজ হিসেব, এর জন্য আইনষ্টাইন হতে হয় না। ষ্ট্র্যাটেজি-র নামে অতিবুদ্ধি করলে গলায় দড়ি অনিবার্য্য। ভেতরের গূঢ় খবর না জেনেও সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা একটা আবছা দৃশ্য দেখতে পারি। অ্যামেরিকার এই শয়তানি পররাষ্ট্রনীতির বয়স বেশী নয়। তার পায়ের নীচের মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে জনান্তিকে। আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠছে দিন দিন। খবরের এই তড়িৎগতির যুগে সবাই জানতে পারছে সবকিছু। ধীরে হলেও দিনে দিনে সরকারের ওপর জনগণের চাপ বাড়বে পররাষ্ট্রনীতি বদলানোর। ইসরাইল-প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান হবেই একদিন, আমরা হয়ত তা দেখেও যাব। চোরের সাত দিন পার হয়ে গেরস্তের একদিন এসে যাবেই একদিন। এখনকার সমস্ত সমস্যা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে। ওখানকার তেলের মালিক মুসলমান না হয়ে হিন্দু-শিখ বা বৌদ্ধ হলেও অ্যামেরিকা ওখানে একই ভাবে মানুষ খুন করত তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই অন্ততঃ মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপারটা ধর্মের যতটা নয় তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থনৈতিক স্বার্থের, যেটা সময়ের সাথে বদলায়।

রাজনৈতিক ইসলামের ব্যাপারটা অর্থনৈতিক স্বার্থের নয় ধর্ম-বিশ্বাসের, যেটা বদলায় না। মধ্যপ্রাচ্যে অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র নীতি প্রতিরোধ তো সে করেই, কিন্তু তার আড়ালে বিশ্ব-জামাত মারাত্মক ভাবে বিশ্ব-মুসলিমকে খুব দ্রতগতিতে কব্জায় এনে ফেলছে। রাজশাহীর জল্লাদ "বাংলা ভাই" এই ঠকবাজীর উজ্জ্বল উদাহরণ। সর্বহারা পার্টিকে উচ্ছেদ করার আড়ালে এই কসাই প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইসলামী শাসনের ভয়াবহতা। কেন হে বাপু? তুমি দাবী করছ সন্ত্রাসী-দমনের, সেজন্য তোমাকে বোরখা বাধ্যতামূলক করতে হবে কেন? নামাজ-রোজা-দাঁড়ি এমনকি ইসলামী জলসায় যাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে কেন? সন্ত্রাসী-দমনের সাথে ওগুলোর সম্পর্ক কি? আর তোমার কথা না মানলেই ঘরে আগুন, আর অমানুষিক অত্যাচার। এ হেন অধিকার তোমাকে কে দিল?

মুখে যা-ই বলুক, এই হল জামাতের ইসলাম, এই তার নবীজীর আদর্শ, মানুষ পিটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। জামাতের অলিগলি না হাতড়ে তাকে কেউ সমর্থন করলে নিজেকেই ঠকাবেন, মানবতাকেও ঠকাবেন আর জাতিকেও ঠকাবেন। মধ্যপ্রাচ্যে অ্যামেরিকা-বৃটেনের উন্মাদ তান্ডবকে ঠেকানোর নামে বিশ্ব-জামাতও রাজশাহীর জল্লাদ র মত তার আসল উদ্দেশ্য শারিয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পুরো মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের ওপর জামাতের প্রভাব অপ্রতিহত ভাবে বেড়ে চলেছে, সব জায়গার সিভিল সোসাইটি ধীরে ধীরে জামাতের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ছে। মুসলিম বিশ্বের দুর্নীতিপরায়ন এবং অযোগ্য সরকারগুলোও অলক্ষ্যে জামাতের সামনে অসহায় হয়ে পড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের মহারাজারাও এখন সাবধান, খুব সাবধান।

আফিগানিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে জামাত এখন রক্তবীজের মত ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। দুনিয়াজুড়ে বিশ্ব-জামাতের বহু শক্তিশালী দল গড়ে উঠেছে যারা নিজের শক্তিতে এককভাবে কাজ করছে। আর কাজ বলতে মানুষ খুন করা। অষ্ট্রেলিয়া-ইউরোপ সেটা কিছুটা বুঝেছে বলে মনে হয়, সরকারগুলো একটু হলেও নড়ে চড়ে উঠেছে। কিন্তু কিভাবে এ দানবকে প্রতিহত করা যাবে তা বোধহয় ওরা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি, খামাখা ঝোপে ঝাড়ে আঘাত করছে। ফ্রান্সের সরকার খামাখা ঝাঁপিয়ে পড়েছে

হিজাবের ওপর, যেন হিজাবই সমস্ত সমস্যার মূল। অ্যামেরিকা এখনো সেটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বুঝলেও অ্যামেরিকার বাপের সাধ্য নেই সেটা কামান বন্দুক দিয়ে বা বোমাবাজী করে ঠেকায়, কারণ যুদ্ধটা সামরিক নয়, সাংস্কৃতিক। সে শক্তিতে অ্যামেরিকা দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল। এর মধ্যেই বইয়ের তাকে বসে থেকে শারিয়ার বইটা হাসতে হাসতে অ্যামেরিকার মত পরাক্রান্ত মহাশক্তিকে মাথায় তুলে হাড্ডিভাঙ্গা আছাড় মেরে ছুঁড়ে ফেলেছে আফগানিস্তানের বাইরে, ওখানে আর নাক গলানোর ক্ষমতা নেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের। এর মধ্যেই সেখানে শারিয়ার অস্ত্রে শুরু হয়ে গেছে নারী-নিপীড়ন, রেডিয়ো-টিভিতে মেয়েদের খবর পড়াও নিষিদ্ধ, গানবাজনা নাটক তো দুরের কথা। ইরাকেও শারিয়াই জয়ী হবে, অ্যামেরিকা-বৃটেনের বাপ-দাদার সাধ্য নেই তা ঠেকায়। এদিকে দেশের ভেতরে বুকের ওপরে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ঘাপটি মেরে বসে আছে অ্যামেরিকান জামাত, শারিয়া-কমিটি, সুরা-কমিটি জাতিয় প্রকান্ড কিছু অশ্বডিম্বের সাথে পুলিশ-মেয়রের সাথে দোস্তি এবং উকিল-মোক্তারের দল তৈরি করে রেখেছে সে। বুশ-সরকারের ভুলগুলোকে পুঁজি করে নাগরিক অধিকার খাটিয়ে তার মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ছাড়বেই সে একদিন। ক্যানাডিয়ান জামাত এর ভেতরে শুরু করে দিয়েছে শারিয়া-কোর্ট, ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে এদেশে এসে ওই ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের বুকেই ছুরি মেরেছে সে। বৃটেনেও আছে ইসলামী পার্লামেন্ট না কি যেন একটা ঘোড়ার ডিম। সারা ইউরোপে অষ্ট্রেলিয়ায় এখন বিশ্ব-জামাতের বসন্ত-ক্ষত ছড়ানো।

তা হলে, কে জিতল? কে জিতছে, কার শক্তি বেশী? চোদ্দশ' বছরের শক্ত শেকড়ের ওপর জামাত প্রতিষ্ঠিত, ইসলামী খেলাফতের নামে তেরোশ' বছরের ক্ষমতার লড়াইয়ের হিংস্রতায় সে শক্তিশালী। ইউরোপ-অ্যামেরিকার চেয়ে অনেক বেশী লোকের কাছে, এক হাজার তিন'শ মিলিয়ন মুসলমানের মনে ধর্ম-বিশ্বাসের মত সংবেদনশীল আবেগের ওপরে তার সম্মোহনী আবেদন সারা পশ্চিমের চেয়ে হাজার গুনে শক্তিশালী। কোটি জামাতির শিরা-উপশিরায় অদৃশ্যে চলাফেরা তার, অপ্রতিরোধ্য হুকুম দেবার ক্ষমতা তার। এক সুইসাইডাল স্কোয়াড গঠনে মাথার ঘাম পায়ে পড়ে অ্যামেরিকার, অজস্র নিয়মকানুনের মধ্যে অজস্র পয়সা খরচ করতে হয়। আর মুহুর্তের অঙ্গুলী হেলনে বেহেশতের লোভ দেখিয়ে বিনে পয়সায় হাজার যোদ্ধার সুইসাইডাল স্কোয়াড মাঠে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে জামাত। মানবতার এ বড় মারাত্মক শত্রু। যুদ্ধ করার, মানুষ খুন করার, বন্দীদের ওপরে অত্যাচার করার হিসেব এবং জবাব দিতে হয় অ্যামেরিকাকে। মুখে যা-ই বলুক মানুষের কাছে জামাতের কোন জবাবদিহিতা নেই, তার অদৃশ্য জবাবদিহিতা শুধু অদৃশ্য আল্লার কাছে। অতিত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম নারী তার হিংস্রতার শিকার, কত হবে সংখ্যাটা? প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তো দুরের কথা, এই হিংস্রতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা পর্য্যন্ত সে অবশ করে দেয় তার সম্মোহনে, এমনকি ওই শিকারদের অনেকের সমর্থন পর্য্যন্ত আদায় করে ছাড়ে সে। তার এই অসম্ভব ম্যাজিকের তুলনায় অ্যামেরিকা পররাষ্ট্র-নীতি তো নস্যি।

এক দানবের বাহানায় অন্য দানবকে ছাড় দিতে পারিনা আমরা, তপ্ত কড়াই থেকে বাঁচবার জন্য জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারিনা। এ দুজনেই অসৎ, দু'জনেই নিষ্ঠুর অমানবিক। এই দুই দানব স্বার্থের জন্য নির্লজ্জভাবে পরস্পরের বন্ধুও হয়, আবার শত্রুও হয়। পৃথিবীর কামান-বন্দুক আর বোমাকে কব্জা করেছে অ্যামেরিকা, আর জামাত কব্জা করেছে আল্লা-রসুল-কোরাণ। কে বেশী শক্তিশালী?

এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই আছে নিদর্শন।

ফতেমোল্লা
১৬ই মে, ৩৩ মুক্তিসন।